জাতীয় বাজেট কনফারেন্স - ২০২৬

ভঙ্গুর অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে স্বনির্ভর ইসলামী বাজেটের রূপরেখা

(কনফারেন্সে উপস্থাপিত বক্তব্যসমূহ হতে সংকলিত)

হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

সূচীপত্র

০১.	ভূমিকা	পৃষ্ঠা ০৩
০২.	বক্তব্য-১: সাম্রাজ্যবাদী ঋণ এবং শোষণমূলক পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক মডেলের ফাঁদে আবদ্ধ জাতীয় বাজেট (২০২৬-২০২৭) এর স্বরূপ উন্মোচন	পৃষ্ঠা ০৪
০৩.	বক্তব্য-২: স্বনির্ভর অর্থনীতি ও জনকল্যাণভিত্তিক ইসলামী বাজেটের রূপরেখা	পৃষ্ঠা ১৩
০৪.	উপসংহার	পৃষ্ঠা ২৩

২৪ জুলাই, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

১০ সফর, ১৪৪৮ হিজরী

(কনফারেন্সে উপস্থাপিত বক্তব্যসমূহের ভিডিও লিংক)

ভূমিকাঃ

পতিত হাসিনা সরকার বিভিন্ন অপরিকল্পিত উন্নয়ন প্রকল্প, মেগা প্রকল্পসমূহে মেগা দুর্নীতি, আদানী গ্রুপের কাছ থেকে উচ্চমূল্যে বিদ্যুৎ আমদানীসহ দেশী-বিদেশী পুঁজিপতি কোম্পানিসমূহকে বিদ্যুৎ ব্যবহার না করেও হাজার কোটি টাকা ক্যাপাসিটি চার্জ প্রদান করে দেশের জনগণের উপর বিশাল করের বোঝা চাপায়। এছাড়া তার মদদপুষ্ট কতিপয় পুঁজিপতি ব্যাংকিং খাতকে লোপাট করে আমানতকারিদেরকে পথে বসায় এবং বিলিয়ন-বিলিয়ন টাকা বিদেশে পাচার করে। সর্বোপরি, পতিত হাসিনা দেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেয়।

ছাত্র-জনতার লাশের উপর ক্ষমতায় আসা অন্তর্বর্তী সরকার পতিত হাসিনার রেখে যাওয়া ভঙ্গুর অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে কোন কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। গণঅভ্যুত্থানের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণতো দূরের কথা, তারা শেষ মুহুর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে Agreement on Reciprocal Trade (ART) সই করে দেশের অর্থনীতির উপর মার্কিনীদের একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তারে সুযোগ করে দিয়ে জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

বিশেষ করে, অর্থনীতি পুনরুদ্ধার, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, কর্মসংস্থান এবং জনকল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি সরকার ৯.৩৮ লক্ষ কোটি টাকার প্রথম বাজেট ঘোষণা করেছে। কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা হলো, এই বাজেটে সংখ্যাগত কিছু রদবদল ছাড়া কাঠামোগত কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়নি – সাম্রাজ্যবাদী ঋণের বেড়াজাল এবং শোষণমূলক ভ্যাট-ট্যাক্স নির্ভর রাজস্ব কাঠামো আগের মতই রয়ে গেছে। এই প্রেক্ষাপটে, আমরা **হিযবুত তাহ্‌রীর**, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ, **"ভঙ্গুর অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে স্বনির্ভর বাজেটের রূপরেখা"** - শীর্ষক এই অনলাইন কনফারেন্সের আয়োজন করেছি।

বক্তব্য ০১:

সাম্রাজ্যবাদী ঋণ এবং শোষণমূলক পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক মডেলের ফাঁদে আবদ্ধ জাতীয় বাজেট (২০২৬-২০২৭) এর স্বরূপ উন্মোচন

ছাত্র-জনতার জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পরে জনগণের প্রত্যাশা ছিল তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে, তাদের সমস্যাগুলো সমাধান হবে। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকার দেশের জনগণকে হতাশ করেছে। দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন উর্ধ্বগতি, সর্বস্তরে উপযুক্ত কর্মসংস্থানের অভাব – বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে প্রত্যাশিত কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা ও হতাশা, দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণে হিমশিম খাচ্ছে। মানসম্মত শিক্ষা ও চিকিৎসা একদিকে যেমন সাধারণ জনগণের নাগালের বাইরে, আবার অন্যদিকে যাদের সামর্থ্য রয়েছে তাদেরকে উন্নত শিক্ষা ও চিকিৎসার জন্য বিদেশ যেতে হচ্ছে। বার বার তেল-গ্যাস-বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ জনগণের নাভিশ্বাস বাড়িয়ে দিচ্ছে এবং কৃষি ও শিল্পোৎপাদনের গতিকে বাধাগ্রস্ত করছে। ব্যবসা-বাণিজ্যে অচলাবস্থা বিরাজ করছে। সর্বোপরী, দেশের অর্থনীতি ভঙ্গুর ও পরনির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।

এরকম প্রেক্ষাপটে বিএনপি সরকার ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ৯ লক্ষ ৩৮ হাজার কোটি টাকার বাজেট প্রস্তাব করেছে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী জোরদার এবং বৈষম্যহীন, মানবিক ও সবার অংশগ্রহণমূলক অর্থনীতি গড়ে তোলা তাদের ঘোষিত এই বাজেটের অন্যতম কৌশলগত লক্ষ্য।

কিন্তু রূঢ় বাস্তবতা হচ্ছেঃ এই বাজেটে সংখ্যাগত রদবদল ছাড়া কাঠামোগত কোন পরিবর্তন আনা হয়নি। অতীতের বাজেটগুলোতে, প্রধান রাজস্বখাত ছিল ভ্যাট-ট্যাক্স, বর্তমানেও তাই আছে। অতীতেও, ঋণ ও ঋণের সুদ ছিল, বাজেট ঘাটতি ছিল, বর্তমানেও তাই আছে। অতীতের বাজেটে ADP, জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও কর-জিডিপি অনুপাতের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হতো, এবারের বাজেটেও ঠিক একই খাতগুলোতে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ বাজেটের খাতগুলো হুবহু একই আছে, শুধু পরিবর্তন হয়েছে সংখ্যায় ও বরাদ্দে; কিন্তু কাঠামোগত নির্ভরশীলতা আগের মতোই রয়ে গেছে। অর্থাৎ, পতিত হাসিনার শাসন আমলের বাজেট কাঠামো এবং অন্তর্বর্তী সরকারের বাজেট কাঠামোর সাথে বর্তমান বাজেটের কাঠামোগত কোন পার্থক্য নাই, শুধুমাত্র বরাদ্দের মধ্যে সংখ্যাগত রদবদল ও স্লোগাণের মধ্যে কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে।

অতীতের বাজেটগুলো জনগণের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থতার কারণ হচ্ছে, সেগুলো পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী প্রতিষ্ঠান আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংক এর প্রেসক্রিপসনে করা হয়েছে, এবং

সেখানে শোষণমূলক পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক মডেল অনুসরণ করা হয়েছে। সুতরাং, একই কাঠামোয় প্রণীত বর্তমান বাজেটও ব্যর্থ হবে, এটাই কি স্বাভাবিক নয়!

১.ট্রিকল-ডাউন অর্থনৈতিক মডেল এবং কতিপয় পুঁজিপতির হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূতকরণ:

বর্তমান ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটও পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক মডেল (ট্রিকল-ডাউন অর্থনীতি) নীতির ধারাবাহিকতা বহন করছে। এই অর্থনীতি মডেলের মূল ধারণা হলো – পুঁজিপতিগোষ্ঠী ও বৃহৎ কর্পোরেট খাতের উপর কর ও নিয়ন্ত্রণের বোঝা কমানো হলে তারা অধিক বিনিয়োগ, উৎপাদন ও ব্যবসা সম্প্রসারণে উৎসাহিত হবে। এর ফলে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, মজুরী ও আয় বৃদ্ধি পাবে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুফল ধীরে ধীরে সমাজের নিম্ন ও মধ্য আয়ের জনগোষ্ঠীর কাছেও পৌঁছাবে। অর্থাৎ, সম্পদ ও প্রবৃদ্ধির সুবিধা অর্থনীতির উপরের স্তর থেকে নিচের স্তরে "গড়িয়ে পড়বে" (Trickle-Down) বলে এই তত্ত্বে ধারণা করা হয়। ধনীদের কর ছাড় বা ব্যবসায়িক সুবিধা দিলে তারা লাভবান হয়, যা পরে নতুন চাকরি ও বিনিয়োগের মাধ্যমে গরিব ও সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যায় – এমন ধারণাই "ট্রিকল-ডাউন" অর্থনৈতিক মডেল।

অতীতের মত বর্তমান বাজেটেও এই পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রতিফলন দেখা যায়। আইএমএফ-এর প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী কর-জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধির তাগিদে বর্তমান বাজেটে সরকার ব্যাপক রাজস্ব টার্গেট পূরণ করতে একদিকে মুদি দোকান, গৃহস্থালী পণ্যসহ ১৬ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী খাতকে করের আওতায় আনার পরিকল্পনা করেছে (মানবজমিন, ২৪ জুন ২০২৬); আর অন্যদিকে, তালিকাভুক্ত কোম্পানীগুলোর কর্পোরেট ট্যাক্স হার কমিয়ে ২২.৫ থেকে ২০ শতাংশ, আর অতালিকাভুক্ত কোম্পানীর জন্য ২৭.৫ থেকে ২৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করেছে (The Daily Star, 11 June 2026)। শিল্পখাতে আমদানী শুল্ক ৫ শতাংশ থেকে ৪ শতাংশে হ্রাস এবং বিদেশী বিনিয়োগকারীদের ডিভিডেন্ড প্রত্যাবাসনের উপর উৎস কর ১৫ শতাংশ থেকে ৭.৫ শতাংশে নামিয়ে আনার মতো পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এছাড়া মাতারবাড়ী ও আনোয়ারা এলাকায় শুল্কমুক্ত ফ্রি ট্রেড জোন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগও বৃহৎ দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য বিশেষ সুবিধা নিশ্চিত করবে।

সরকারের দাবী, এর মাধ্যমে বিনিয়োগ, উৎপাদন ও ব্যবসা সম্প্রসারিত হবে, জিডিপি এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে। এটাই পুঁজিবাদী (ট্রিকল-ডাউন) অর্থনীতি মডেল। পতিত হাসিনাসহ অতীতের সব সরকার এই একই নীতিতে বাজেট প্রণয়ন করেছে। এর ফলাফল হচ্ছে, একদিকে কতিপয় পুঁজিপতি শ্রেণী সম্পদের পাহাড় তৈরি করছে, আর মধ্যবিত্ত শ্রেণী ক্রমান্বয়ে দারিদ্রতা বরণ করছে এবং দরিদ্র শ্রেণী মাটির সাথে মিশে যাচ্ছে।

The Business Standard (২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫) প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশের শীর্ষ ১০% মানুষের হাতে দেশের মোট সম্পদের ৫৮.৫%, অথচ নিচের ৫০% মানুষের হাতে মাত্র ৪.৮% সম্পদ রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এই পুঁজিবাদী নীতির ফলে জিডিপি প্রবৃদ্ধি যতই বৃদ্ধি পায়, অর্থনীতির আকার যত বড় হয়, ততই সম্পদ কতিপয় পুঁজিপতির হাতে কুক্ষিগত হয় এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠী মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়।

আপনারা নিশ্চয়ই দেশের অর্থনীতির উপর এসব পুঁজিপতির নিয়ন্ত্রণ প্রত্যক্ষ করছেন। সহজ ঋণ প্রাপ্তির সুবিধা পেয়ে এসকল পুঁজিপতি সুকৌশলে ব্যাংক লুটপাট করছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী, মার্চ ২০২৬ শেষে মোট খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫ লাখ ৬৪ হাজার ১০৬ কোটি টাকা (০২ জুন ২০২৬, বাংলা ট্রিবিউন), যা বাংলাদেশের মোট বাজেটের অর্ধেকের চেয়েও বেশি।

একদিকে, বিপুল অর্থ তারা বিদেশে পাচার করে আমাদের অর্থনীতিকে ভঙ্গুর করে দিচ্ছে, আর অন্যদিকে, এই অর্থের যোগান দিতে সরকার বারবার টাকা ছাপাচ্ছে এবং জনগণের উপর ট্যাক্স আরোপ করছে। রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দায় চাপানোর ধরন বদলালেও সমস্যার কাঠামোগত চরিত্র অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। এই চিত্র আমরা গত পাঁচ দশক যাবত দেখে আসছি।

বিগত সরকারের সময় প্রত্যাশা ছিল, খেলাপী ঋণের পরিমাণ কমবে, কিন্তু তা না হয়ে বরং আরো বেড়েছে। বর্তমান বিএনপি সরকারের সময় খেলাপী ঋণের পরিমাণ যে বাড়বে না এর নিশ্চয়তা কী? এই চক্রাকার পুনরাবৃত্তি মূলতঃ ট্রিকল-ডাউন অর্থনৈতিক মডেলেরই ফলাফল।

আরও ভয়াবহ চিত্র আমরা লক্ষ্য করছি, যখন আইএমএফ-বিশ্বব্যাংকের ফেরি করা মুক্তবাজার নীতির আওতায় সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ (FDI)-এর মাধ্যমে ইউনিলিভার, ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো, মোবাইল অপারেটর কোম্পানীসহ বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানী আমাদের দেশের বাজার দখল করে রেখেছে। জনগণের পকেট লুট করছে আর দেশের শিল্পকে ধ্বংস করে ফেলছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে পরনির্ভরশীল ও দেউলিয়াগ্রস্থ হয়ে পড়ছে, ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট আমাদের প্রতিকূলে চলে গেছে, যার কারণে আমরা বার বার রিজার্ভ সংকটের সম্মুখীন হচ্ছি এবং ঋণের জন্য সাম্রাজ্যবাদী প্রতিষ্ঠান আইএমএফ-বিশ্বব্যাংকের শিকারে পরিণত হচ্ছি। অথচ আমরা লক্ষ্য করছি বর্তমান বাজেটের অন্যতম কৌশলগত অগ্রাধিকার হচ্ছে বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ করা যা আমাদের অর্থনীতির জন্য আত্মঘাতী।

তাই এই শোষণমূলক ট্রিকল-ডাউন অর্থনৈতিক কাঠামোর আওতায় যত বাজেটই করা হউক না কেন, জনগণের সমৃদ্ধিতো দূরের কথা, অর্থনৈতিক দুর্দশা থেকেই কখনো মুক্তি মিলবে না।

২. রাষ্ট্রের শোষণমূলক কর কাঠামো:

বর্তমান বাজেটে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৬ লক্ষ ৯৫ হাজার কোটি টাকা। এই বিশাল অঙ্কের প্রায় ৬০ ভাগই আসবে পরোক্ষ কর থেকে – যেমন ভ্যাট, আমদানী শুল্ক ও সম্পূরক শুল্ক। পরোক্ষ করের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, এটি আয়ের পার্থক্য বিবেচনা না করে সবার উপর সমান বোঝা চাপায় – ধনী হোক বা গরিব, বয়স্ক হোক বা শিশু, সুস্থ হোক বা প্রতিবন্ধী। হিসাব করলে দাঁড়ায়, প্রতিটি মানুষের কাছ থেকে গড়ে প্রায় ৩৯ হাজার টাকা রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

অতীতের বাজেটগুলোর সাথে বর্তমান বাজেটের এক্ষেত্রে কিছু সংখ্যাগত পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু কর কাঠামো বিবেচনা করলে দেখা যাবে এটি বর্তমান ও অতীতের সকল বাজেটের একটি মৌলিক অপরিবর্তনীয় কাঠামো।

ভ্যাট সাধারণত পণ্য ও সেবার মূল্যের সঙ্গে যুক্ত থাকে। ফলে একজন নিম্ন আয়ের ব্যক্তি ও একজন উচ্চ আয়ের ব্যক্তি একই পণ্যে একই হারে ভ্যাট দেন। কিন্তু নিম্ন আয়ের মানুষ তাদের আয়ের বড় অংশ ভ্যাট দিতে ব্যয় করেন, তাই তাদের আয়ের তুলনায় ভ্যাটের বোঝা বেশি হয়। যেহেতু খাদ্য, ওষুধ, পরিবহন বা নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের উপর ভ্যাট আরোপ করা হয়, তাহলে দরিদ্র ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় তুলনামূলকভাবে বেশি বৃদ্ধি পায়। সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ এর মতে এই বাজেটে *"সাধারণ ভোক্তা ও মধ্যবিত্তের উপর করের বোঝা আরো বাড়াবে। সেই সাথে তা ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসার উপর তীব্র মানসিক ও আর্থিক চাপ সৃষ্টি করবে।"*

এছাড়া ভ্যাট, আমদানী শুল্ক ও সম্পুরক কর ব্যবস্থা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে স্থবির করে দেয়। ফলে এই করনীতি একদিকে যেমন শোষণমূলক, অন্যদিকে অর্থনীতির জন্য আত্মঘাতি। কারণ এসব কর পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করে এবং জনগণের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস করে। ফলে পণ্যের চাহিদা কমে যায় এবং শিল্পকারখানাকে উৎপাদন হ্রাস করতে বাধ্য করে; ফলে শিল্পকারখানায় উৎপাদন প্রবৃদ্ধি স্থবির হয়ে পড়ে। কর্মী ছাটাইয়ের কারণে কর্মসংস্থান সংকট তৈরি হয়। তখন সরকারকে অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করে জিডিপি বৃদ্ধি করার উদ্যোগ নিতে হয়, যা আমরা প্রতিটি বাজেটেই প্রত্যক্ষ করছি।

কৃষিক্ষেত্রেও একই সমস্যা। সার, বীজ, কীটনাশকসহ কৃষির অপরিহার্য উপকরণের

উপর স্তরে স্তরে কর থাকায় উৎপাদন খরচ অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাচ্ছে। এই বাড়তি খরচ সামলাতে গিয়ে সরকারকে প্রতিবছর ১৭ থেকে ২৫ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দিতে হচ্ছে। ফলে এই পরোক্ষ কর কাঠামো মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম কারণ। তাই পরোক্ষ কর চালু রেখে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে সকল সরকার ব্যর্থ হয়েছে।

৩. সামাজিক নিরাপত্তা এবং কল্যাণ রাষ্ট্রের বিভ্রমঃ

সরকার বাজেটে নিম্ন আয়ের নাগরিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা খাতকে গুরুত্ব দিয়ে 'ফ্যামিলি কার্ড', 'কৃষক কার্ড', 'হেলথ কার্ড'সহ, দেশব্যাপী স্থানীয় সরকার ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে 'খাল খনন' ইত্যাদি কর্মসূচী গ্রহণ করেছে এবং এই লক্ষ্যে বাজেট বরাদ্দ দিয়েছে। ২৫ লক্ষ নাগরিকের জন্য ই-হেলথ কার্ডের মতো উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বর্তমান বাজেটে বলা হচ্ছে, বাংলাদেশকে একটি কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করা হবে। প্রকৃতপক্ষে, এসকল কর্মসূচী জনগণের সমস্যার তুলনায় খুবই সীমিত এবং মূল সমস্যাকে আড়াল করার বৃথা চেষ্টা। জনগণের যখন দরকার কর্মসংস্থান তার পরিবর্তে তারা পাচ্ছে বিভিন্ন ডিসকাউন্ট কার্ড ও ভাতার প্রতিশ্রুতি। একদিকে মুদি দোকানদারকে ট্যাক্সের আওতায় আনছে, আর অন্যদিকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো – এই কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণাটি আসলে কোথা থেকে ধার করা হয়েছে? এবং যেখান থেকে ধার করা হয়েছে, সেখানে এর পরিণতি কী হয়েছে?

ওয়েল ফেয়ার স্টেট ব্রিটেনের কথাই যদি বলি, সেখানে NHS, বেকারত্ব ভাতা, পেনশন, আবাসন সুবিধা দিতে গিয়ে জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে বিশাল করের বোঝা। ডেনমার্ক বা সুইডেনের মতো নর্ডিক দেশগুলোতে করের হার বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ। এই মডেলের আরও গভীর সমস্যা আছে–রাষ্ট্র নাগরিকের জীবনের প্রতিটি দিকে নাক গলায়, চিরস্থায়ী সরকারী ঋণের উপর নির্ভরশীলতা তৈরি হয়, আর দীর্ঘমেয়াদে মানুষের স্বনির্ভরতা ও কাজের স্পৃহা নষ্ট হয়ে যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যুক্তরাজ্যে এখন প্রতিবন্ধী ভাতা ন্যূনতম মজুরীর চেয়েও ২,৫০০ পাউন্ড বেশি – ফলে অনেকে কাজ করার চেয়ে ভাতার উপর নির্ভরশীল থাকাকেই বেশি লাভজনক মনে করছেন।

আরও গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় জানা দরকার – এই কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণার জন্ম আসলে মানুষের প্রতি ভালোবাসা থেকে নয়। ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের পর যখন শ্রমিকদের ক্ষোভ বিস্ফোরণের পথে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যখন ব্রিটেনে জনরোষ তুঙ্গে, ১৯২৯ সালের মহামন্দায় যখন আমেরিকায় মানুষ রাস্তায় – তখন শাসকশ্রেণী এই কল্যাণমূলক

সুবিধাগুলো চালু করে মূলত সেই ক্ষোভকে ঠান্ডা করতে। স্নায়ুযুদ্ধের সময় পশ্চিমা দেশগুলো সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের বিপরীতে নিজেদের আকর্ষণীয় দেখাতে এই মডেলকে আরও জোরালোভাবে প্রচার করে। অর্থাৎ কল্যাণ রাষ্ট্র ছিল একটি রাজনৈতিক হাতিয়ার, জনগণের প্রকৃত মুক্তির পথ নয়।

৪. ঋণের ফাঁদ (Debt Trap):

বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণ প্রায় ৭৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা আমাদের বাজেটের চেয়েও বেশী এবং এর পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে (২১ এপ্রিল ২০২৬, দৈনিক ইত্তেফাক)। ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেট ঘাটতি পূরণের জন্য সরকার মোট ১ লাখ ৫৫ হাজার ৮৫০ কোটি টাকা বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এর মধ্যে ৪৬ হাজার কোটি টাকা পূর্ববর্তী বৈদেশিক ঋণের আসল পরিশোধে ব্যয় হবে। ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে বৈদেশিক ঋণের সুদ বাবদ ২২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বছরের পর বছর বৈদেশিক ঋণ এবং ঋণের সুদ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে বাংলাদেশ বৈদেশিক ঋণের ফাঁদে আটকা পড়েছে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে রাষ্ট্র নতুন উৎপাদনশীল খাত গড়ে তোলার জন্য ঋণ গ্রহণের চেয়ে আগের ঋণের পুঞ্জীভূত সুদ এবং কিস্তি পরিশোধের চাপ সামাল দিতেই নতুন ঋণের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। ফলে দেশ ক্রমশ এমন এক ঋণচক্রে আবদ্ধ হচ্ছে, যেখানে পুরোনো ঋণের দায় মেটাতেই কঠোর শর্তযুক্ত নতুন ঋণ গ্রহণ করতে হচ্ছে।

বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণ মূলত বহুপাক্ষিক উন্নয়ন সংস্থা (Multilateral Development Partners), দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন অংশীদার (Bilateral Partners) এবং সীমিত পরিসরে বাণিজ্যিক ঋণদাতাদের কাছ থেকে আসে। যেমনঃ World Bank, Asian Development Bank এবং Japan International Cooperation Agency অন্যতম, China-এর সরকারী ঋণ ও এক্সিম ব্যাংক, India-এর লাইন অব ক্রেডিট, Russia-এর প্রকল্পভিত্তিক ঋণ (বিশেষতঃ রূপপুর প্রকল্প)। বেশিরভাগ অবকাঠামো প্রকল্প (সেতু, রেল, বিদ্যুৎকেন্দ্র, মেট্রোরেল ইত্যাদি) বাস্তবায়নের জন্য বিদেশী ঠিকাদার, পরামর্শক, যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। ফলে ঋণের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ঋণদাতা দেশের কোম্পানীগুলোর কাছে ঠিকাদারী, যন্ত্রপাতি ও সেবা বাবদ চলে যায়। আর ঋণ এবং ঋণের সুদের বোঝা জনগণের কাঁধে চাপে। এই ঋণ দেশের বাৎসরিক জিডিপি বৃদ্ধি করলেও দীর্ঘ মেয়াদে ব্যাল্যান্স অব পেম্যান্ট-এর উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে এবং অর্থনীতিকে দেউলিয়াগ্রস্ত করে ফেলে।

মহাখালী ফ্লাইওভার মূলত বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে নির্মিত হয়েছিল। এটি ছিল World Bank-অর্থায়িত Dhaka Urban Transport Project (DUTP)-এর অংশ। বিশ্বব্যাংকের আন্তর্জাতিক টেন্ডারের স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিফাই করতে না পেরে দেশীয় কোম্পানীগুলো এসকল প্রকল্পে কোন সুযোগ পায় না, ফলে বিদেশী কোম্পানীগুলো প্রজেক্টের সিংহভাগ টাকা নিয়ে চলে যায়।

আর অন্যদিকে, নিজেদের অর্থায়নে উন্নয়ন প্রকল্প করলে নিজেদের টাকা নিজেদের কাছেই থাকে। যেমন: খিলগাঁও ফ্লাইওভার নির্মাণ করেছে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে।

দ্বিপাক্ষিক দাতাদের ক্ষেত্রে চিত্রটা আরও স্পষ্ট। জাইকার মতো সংস্থাগুলো শাহজালাল বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল, মেট্রোরেল, মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দরের মতো বড় বড় প্রকল্পে ঋণ দেয়। কিন্তু সেই ঋণের সিংহভাগ তারা নিজেরাই তাদের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে, নিজস্ব কোম্পানীর মাধ্যমে খরচ করে নিয়ে যায়। আমাদের জন্য অবশিষ্ট থাকে কী? সস্তা শ্রম দেয়া, আর পরিশোধ করতে হয় সেই ঋণ ও তার সুদ। অর্থাৎ প্রকল্পের সুবিধা নেয় তারা, আর দায় চাপে আমাদের ঘাড়ে।

হাম্বানটোটা বন্দর নির্মাণের জন্য চীনের কাছে নেয়া ঋণ পরিশোধে অক্ষম হয়ে শ্রীলঙ্কা হাম্বানটোটা বন্দর একটি চীনা রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানীর কাছে ৯৯ বছরের জন্য ইজারা (lease) দেয়, যার মাধ্যমে ভারী ঋণে জর্জরিত করে তাদের কৌশলগত সম্পদ দখল করা হয়। পাকিস্তান সরকার গোওয়াদর (Gwadar) বন্দর পরিচালনার দায়িত্ব চীনের রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানী China Overseas Port Holding Company (COPHC)-এর কাছে হস্তান্তর করে।

এরূপ চুক্তির ফলে কৌশলগত সম্পদের উপর বিদেশীদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয়। তাই তিস্তা প্রকল্পে চীনা ঋণের মাধ্যমে অর্থায়ন বাংলাদেশের জন্য কতটা লাভজনক ও টেকসই হবে, তা এখন গুরুত্বের সঙ্গে প্রশ্ন করার সময় এসেছে। এর উত্তর কে দেবে, যেখানে গত চার দশক ধরে আমাদের নীতিনির্ধারকদের মাথায় একটি ধারণা গেঁথে দেয়া হয়েছে যে, রাজস্ব ঘাটতি পূরণ করতে এবং প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে হলে বিদেশী ঋণ ও শর্তযুক্ত সাহায্যই একমাত্র পথ। এই বিভ্রান্তির ফলাফল আজ স্পষ্ট।

অন্যদিকে, একটি বড় পরিহাসের বিষয় হচ্ছে, বাংলাদেশ প্রতিবছর ৩০ বিলিয়ন ডলারের বেশী রেমিট্যান্স পায় – যা আমাদের জিডিপি'র ৬.৫৭ শতাংশ এবং মোট আমদানী ব্যয়ের প্রায় ৪৭ শতাংশ। এই বিশাল অর্থের সবটুকু আসে আমাদের দেশের শ্রমজীবী মানুষের পরিশ্রম থেকে – যার কোনো শর্ত নেই, কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

অথচ, রাষ্ট্র এই সম্পদকে জাতীয় উন্নয়নের মূলধনে পরিণত করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। উল্টো যা ঘটছে তা রীতিমতো আত্মঘাতী। শর্তহীন রেমিট্যান্সের এই বিশাল প্রবাহ থাকার পরেও সরকার ছুটছে আইএমএফ-এর কঠোর শর্তযুক্ত মাত্র ৪ বিলিয়ন ডলারের ঋণের পেছনে। শর্তহীন অর্থ উপেক্ষা করে শর্তযুক্ত ঋণ বেছে নেয়ার এই সিদ্ধান্ত কেবল অদূরদর্শীতাই নয়, সরাসরি দেশ ও জনগণের স্বার্থবিরোধী।

৫. ঋণের শর্ত এবং অর্থনৈতিক দাসত্ব:

১৯৭৪ সালে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) এর সদস্যপদ গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশের পলিসি সার্বভৌমত্ব হরণের প্রক্রিয়াটি শুরু হয়। ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকে 'ওয়াশিংটন কনসেনসাস' ও Structural Adjustment Programs (SAPs)-এর আওতায় বাংলাদেশ তার অর্থনীতিতে আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংক নির্ধারিত বাণিজ্য উদারীকরণ, বেসরকারীকরণ এবং শিল্পখাতে রাষ্ট্রের ভূমিকা সংকোচনের নীতি অনুসরণ করে।

১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ স্টিল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন (BSEC) ছিল দেশের অন্যতম প্রধান রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কর্পোরেশন। ইস্পাতজাত পণ্য, প্রকৌশল সামগ্রী ও বিভিন্ন ধরনের যানবাহন সংযোজন ও উৎপাদনের মাধ্যমে এটি দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশের ভারী শিল্প ও শিল্পায়নের অন্যতম ভিত্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করতে পারতো। আইএমএফ-এর পরামর্শ মেনে বাংলাদেশে বহু রাষ্ট্রায়ত্ত ভারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে বেসরকারীকরণ বা পুনর্গঠন করা হয়েছে। এর ফলে দেশীয় শিল্পায়নের ভিত্তি দুর্বল হয়েছে এবং দেশের অর্থনীতিতে আমদানী ও বিদেশী পুঁজির উপর নির্ভরতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

অথচ জার্মানী-চীনসহ সকল শিল্পোন্নত রাষ্ট্রের ভারী শিল্পের মূল অবকাঠামো গড়ে উঠেছে রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে। তাই, আইএমএফ-বিশ্বব্যাংক কে বলা হয় সাম্রাজ্যবাদী প্রতিষ্ঠান, কারণ তাদের মূল লক্ষ্য হলো একটি দেশের অর্থনীতির মূলভিত্তিকে ধ্বংস করে তাদের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা। এই প্রক্রিয়ায় দেশের পাটশিল্প বন্ধ করা হয়েছে এবং চিনিশিল্প ও কৃষিখাত ICU তে আছে।

আইএমএফ-এর ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট গাইডলাইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ রিজার্ভ ধরে রাখার শর্ত রাষ্ট্রকে জরুরী প্রয়োজনে নিজস্ব তহবিল ব্যবহারের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করছে। তারা একদিকে রিজার্ভে অলস টাকা ধরে রাখতে বাধ্য করে, অপরদিকে উন্নয়ন প্রকল্পে বিদেশী ঋণের উপর নির্ভরশীল করে আমাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। আইএমএফ-এর প্রেসক্রিপশনে রিজার্ভের আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড মেনে চলে এবং

তাদের সার্টিফিকেটের জন্য অপেক্ষা করে আমরা আমাদের অর্থনীতিকে দুর্বল করছি এবং আইএমএফ-এর অধীনস্ত হচ্ছি।

বাংলাদেশ তেল-গ্যাস-কয়লার মত খনিজে সমৃদ্ধ, যা আমাদের রাজস্বের ব্যাপক উৎস হতে পারে এবং ভারী ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের চালিকাশক্তি হতে পারে। অথচ আইএমএফ-সমর্থিত নীতির ধারাবাহিকতায় উৎপাদন অংশীদারিত্ব চুক্তি (PSC) ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের জ্বালানী সম্পদ উত্তোলনে বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর প্রভাব নিশ্চিত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে, মার্কিন কোম্পানী Chevron বাংলাদেশের উত্তোলিত গ্যাসের প্রায় ৬০ শতাংশ 'কস্ট রিকভারী' হিসেবে কোন জবাবদিহিতা ছাড়াই নিয়ে যায়। অবশিষ্ট অংশের ভাগভাটোয়ারার পর, আমাদের নিজেদের গ্যাস আন্তর্জাতিক বাজারমূল্যের ভিত্তিতে তাদের কাছ থেকে কিনতে হয়। ফলে দেশের জ্বালানী নিরাপত্তা ক্রমশ বিদেশী প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে।

অন্যদিকে, দেশীয় সক্ষমতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বরাদ্দের চিত্র নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে এলএনজি আমদানীর জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৫৮ হাজার কোটি টাকা, যেখানে গ্যাস অনুসন্ধান ও কূপ খননের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে মাত্র ১,১২৯ কোটি টাকা। অর্থাৎ দেশীয় গ্যাস উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির তুলনায় আমদানীনির্ভরতার পেছনে প্রায় ৫১ গুণ বেশী অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, কঠিন শর্তযুক্ত ও সুদভিত্তিক ঋণের জালে আটকানো বর্তমান বাজেট কীভাবে জনগণের মধ্যে স্বস্তি আনবে? আমরা যদি বৈষম্য সৃষ্টিকারী পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক মডেল, শোষণমূলক কর ব্যবস্থা এবং সাম্রাজ্যবাদী প্রতিষ্ঠান বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ এর বলয় থেকে বেরিয়ে একটি স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়তে চাই, তবে অবশ্যই আমাদের প্রয়োজন একটি বিকল্প বাজেট কাঠামো।

বক্তব্য ০২: স্বনির্ভর অর্থনীতি ও জনকল্যাণভিত্তিক ইসলামী বাজেটের রূপরেখা

বর্তমান পুঁজিবাদী বাজেটে বরাদ্দ ও অর্থের পরিমাণে পূর্ববর্তী বাজেটগুলোর তুলনায় কিছু পরিবর্তন দেখা গেলেও এর মৌলিক কাঠামো অতীতের সকল বাজেটের মতই অপরিবর্তিত রয়েছে। আগের বাজেটগুলোর মতো এটিও সাম্রাজ্যবাদী প্রতিষ্ঠান আইএমএফ (IMF) ও বিশ্বব্যাংক (WB)-এর ঋণ এবং শর্তের বেড়াজালে আবদ্ধ।

বর্তমান বাজেটের ভিত্তি হলো পুঁজিবাদী ট্রিকল-ডাউন (Trickle-Down) অর্থনৈতিক মডেল বা নিম্নমুখী প্রবাহভিত্তিক অর্থনৈতিক তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুযায়ী ধারণা করা হয়, ধনী ব্যক্তি ও বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে কর ছাড়, ভর্তুকি কিংবা অন্যান্য সুবিধা প্রদান করলে তারা অধিক বিনিয়োগ করবে; ফলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং এর সুফল ধীরে ধীরে সমাজের নিম্ন আয়ের মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে। কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন, কারণ সম্পদ নিম্নমুখী প্রবাহ বা Trickle-Down না হয়ে পুঁজিপতি শ্রেণীর মধ্যেই পুঞ্জীভূত থাকে।

অপরদিকে, খিলাফত রাষ্ট্রের বাজেট কাঠামোর ভিত্তি হলো ইসলামী অর্থনৈতিক মডেল, যা আল্লাহ্ (ﷻ) কর্তৃক নাযিলকৃত ওহী তথা কুর’আন-সুন্নাহ্ থেকে উৎসারিত। ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম মৌলিক নীতি হচ্ছে, সম্পদ যেন সমাজের অল্প কয়েকজন ধনী ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত না হয়। আল্লাহ্ (ﷻ) বলেন,

«...كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ»

“...যাতে ধন-সম্পদ কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়” [সূরা হাশর : ০৭]

এই নীতির আলোকে ইসলামী অর্থব্যবস্থা সম্পদের ন্যায্য বণ্টন নিশ্চিত করে এবং বৃত্তশালীদের মধ্যে সম্পদের একচেটিয়া কেন্দ্রীকরণ প্রতিরোধ করে। এ দৃষ্টিভঙ্গি পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোর সম্পূর্ণ বিপরীত।

ইসলামী অর্থব্যবস্থার আরেকটি মূলনীতি হচ্ছে, প্রতিটি নাগরিকের ব্যক্তিগত পর্যায়ে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে হবে এবং তার সাথে সম্পর্কিত শিক্ষা-চিকিৎসা-নিরাপত্তার মত মৌলিক অধিকারসমূহ নিশ্চিত করতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন:

«لَيْسَ لِابْنِ آدَمَ حَقٌّ فِي سِوَى هَذِهِ الْخِصَالِ: بَيْتٌ يَسْكُنُهُ،

وَثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ، وَجِلْفُ الْخُبْزِ وَالْمَاءِ»

“আদম সন্তানের জন্য তিনটি বিষয় ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর অপরিহার্য অধিকার নেই – বসবাসের জন্য একটি ঘর, লজ্জা নিবারণের জন্য পোশাক এবং জীবনধারণের জন্য রুটি ও পানি।” (সুনান আত-তিরমিজি, হাদিস : ২৩৪১)

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় রাষ্ট্র সাধারণত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী বা কল্যাণমূলক ভাতার মাধ্যমে সীমিত সহায়তা প্রদান করে। কিন্তু প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক চাহিদা পূরণের দায়িত্ব রাষ্ট্র নিজে গ্রহণ করে না। ফলে এসব কর্মসূচী দারিদ্রতার স্থায়ী সমাধান না করে, বরং সাময়িক সহায়তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। তাই এসব ব্যবস্থা দারিদ্রতার মূল কারণ চিহ্নিত না করে শুধুমাত্র সাময়িক উপশম দেয়। ফলে কখনোই মূল সমস্যা দূরীভূত হয় না। আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণা ইউরোপে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার ফলে সৃষ্ট সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার প্রতিক্রিয়া হিসেবে বিকশিত হয়েছে – যা পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কাঠামোগত দারিদ্রতা দূরীকরণের ব্যর্থতাকেই নির্দেশিত করে।

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় রাষ্ট্রের দায়িত্ব শুধু মৌলিক চাহিদা পূরণেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং বৈধ উপায়ে নাগরিকদের স্বচ্ছল, মর্যাদাপূর্ণ ও সমৃদ্ধ জীবনযাপনের পরিবেশ নিশ্চিত করাও রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

অতএব, এসব নীতিমালার ভিত্তিতেই ইসলামী বাজেট প্রণীত হবে। এর মাধ্যমে একদিকে প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করা হবে, অন্যদিকে সম্পদের ন্যায্য বণ্টনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস, উৎপাদন ও বিনিয়োগের সুষম বিকাশ এবং জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে। সর্বোপরী, এটি হবে আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের ঋণনির্ভরতা থেকে মুক্ত একটি স্বনির্ভর, স্থিতিশীল ও জনকল্যাণমুখী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, ইসলামী অর্থনৈতিক মডেলের উপর ভিত্তি করে প্রণীত বাজেট কীভাবে জনকল্যাণ নিশ্চিত করবে এবং দেশকে স্বনির্ভর অর্থনীতিতে পরিণত করবে তার একটি রূপরেখা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. গণমালিকানাধীন সম্পদ থেকে প্রাপ্ত রাজস্বঃ

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় প্রাকৃতিক সম্পদ ও কৌশলগত সম্পদ জনগণের সম্মিলিত মালিকানাধীন সম্পদ (Public Property) হিসেবে বিবেচিত – যা জ্বালানী নিরাপত্তা

ও উন্নয়ন বাজেটের চালিকাশক্তি। তেল, গ্যাস, কয়লা, বিভিন্ন খনিজসম্পদ, নদ-নদী, সমুদ্র, সমুদ্রবন্দর, নদীবন্দর এবং বিস্তীর্ণ বনভূমি, এসব কোনো ব্যক্তি বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের একচেটিয়া মালিকানায় ন্যস্ত হতে পারবে না; বরং এগুলো সমগ্র উম্মাহ্'র সম্পদ। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন,

«المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلإ والنار»

"*মানুষ তিনটি বিষয়ে অংশীদার – পানি, চারণভূমি এবং আগুন*" (সুনানে আবু দাউদ)

এই নীতির আলোকে গণমালিকানাধীন সম্পদ থেকে অর্জিত রাজস্ব রাষ্ট্রের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক বৃহৎ প্রকল্পে ব্যয় করা হবে; যেমনঃ সড়ক, সেতু, রেলপথ, সমুদ্রবন্দর, বিদ্যুৎকেন্দ্র, সেচব্যবস্থা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জনসেবামূলক অবকাঠামো নির্মাণ এবং উন্নয়নে এই অর্থ ব্যবহার করা হবে। এই রাজস্ব সাধারণ তহবিলে স্থানান্তর করে অন্যান্য প্রশাসনিক কাজে ব্যয় করা হবে না। একইভাবে, গণমালিকানাধীন সম্পদ বেসরকারীকরণ বা ব্যক্তি ও বহুজাতিক কোম্পানীর মালিকানায় হস্তান্তরের সুযোগও থাকবে না।

অতীতে খিলাফত ব্যবস্থার অধীনে বিভিন্ন সময় খলিফারা জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন স্থাপনা তৈরি করেছেন, আব্বাসীয় আমলের তিউনিসিয়ার কাইরুয়ানে অবস্থিত আগলাবিদ জলাধারগুলো হলো এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। উমাইয়া খিলাফতের সময়, বিশেষ করে খলিফা আল-ওয়ালিদের শাসনামলে (৭০৫-৭১৫ খ্রিষ্টাব্দ), বারাদা নদীর (Barada River) খালসমূহ দামেস্ক শহর ও তার চারপাশের কৃষিব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছিল। বারাদা নদী থেকে খনন করা শাখা খালগুলোর মাধ্যমে মরুপ্রায় দামেস্ক অঞ্চল একটি সবুজ মরূদ্যানে পরিণত হয়। ফলে, ঘৌটা মরূদ্যান (Ghouta Oasis) অঞ্চলে ফলমূল, শাকসবজি এবং শস্যের ব্যাপক উৎপাদন শুরু হয়, যা দামেস্কের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিশ্চিত করে। বারাদা নদীর পানিকে বিশেষ ভূগর্ভস্থ প্রণালীর মাধ্যমে সরাসরি ঐতিহাসিক উমাইয়া মসজিদে নিয়ে আসা হয়। এই বিশুদ্ধ পানি মসজিদের ফোয়ারা, অজুখানা এবং শৌচাগারে ব্যবহার করা হতো, যা তৎকালীন উন্নত নাগরিক সভ্যতার প্রমাণ দেয়।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের সম্ভাবনা অত্যন্ত সমৃদ্ধ। যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (USGS) এবং পেট্রোবাংলার যৌথ গবেষণা অনুযায়ী, দেশে এখনো গড়ে প্রায় ৩২.১ ট্রিলিয়ন ঘনফুট অনাবিষ্কৃত প্রাকৃতিক গ্যাস রয়েছে। অন্যদিকে, জিওলজিক্যাল সার্ভে অব বাংলাদেশের (GSB) তথ্য অনুযায়ী, দেশের পাঁচটি প্রধান কয়লাখনিতে প্রায় ৭.৯৬২ বিলিয়ন টন উচ্চমানের বিটুমিনাস কয়লার মজুত রয়েছে। এই রাজস্বের একটি

গুরুত্বপূর্ণ অংশ দেশীয় জ্বালানী খাতের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ করা হবে। বিশেষ করে, বাপেক্স ও পেট্রোবাংলাকে প্রযুক্তিগত, কারিগরী ও আর্থিকভাবে এমন পর্যায়ে উন্নীত করা হবে, যাতে তারা বিদেশী কোম্পানীর উপর নির্ভরশীলতা ছাড়াই স্বাধীনভাবে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলন পরিচালনা করতে পারে। এছাড়া চট্টগ্রাম, মোংলা ও পায়রা সমুদ্রবন্দর থেকেও প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রাজস্ব অর্জিত হয়। এসব সম্পদের সুশাসন ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রাষ্ট্র বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আয় করতে সক্ষম হবে।

এর ফলে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো নির্মাণে বৈদেশিক ঋণের উপর নির্ভরশীলতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে। বর্তমানে বড় বড় উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য যে বিপুল পরিমাণ বিদেশী ঋণ গ্রহণ করা হয় এবং যার বোঝা শেষ পর্যন্ত জনগণকে বহন করতে হয়, গণমালিকানাধীন সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেই নির্ভরতা দূর করা হবে। এছাড়াও জ্বালানী তেলের মূল্যবৃদ্ধি, জ্বালানী নিরাপত্তাহীনতা, উচ্চমূল্যে এলপিজি-এলএলজি আমদানী, বিদ্যুৎ খাতের ক্যাপাসিটি চার্জ এসমস্ত বিষয় থেকে জনগণ মুক্তি পাবে।

২. খারাজঃ

স্বনির্ভর কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তার ভিত্তি খারাজ বা ভূমি কর খিলাফত রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও স্থায়ী রাজস্বের একটি উৎস। খারাজি জমির উৎপাদনক্ষমতা অনুযায়ী ভূমির উপর এই কর আরোপ করা হয়। অর্থাৎ, করের ভিত্তি হবে ভূমির উৎপাদনশীলতা, কৃষকের ব্যক্তিগত সম্পদ বা আয়ের উপর নয়। ফলে খারাজ ব্যবস্থা একদিকে কৃষি উৎপাদনকে উৎসাহিত করে, অন্যদিকে রাষ্ট্রের জন্য একটি স্থিতিশীল ও ন্যায়সঙ্গত রাজস্ব ভিত্তি গড়ে তোলে।

এই নীতির আলোকে রাষ্ট্র কৃষিখাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেবে। কৃষির প্রতিটি স্তরে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, সেচব্যবস্থার উন্নয়ন, উন্নত বীজ, গবেষণা, যান্ত্রিকীকরণ, সংরক্ষণ, পরিবহন ও বাজারজাতকরণে প্রয়োজনীয় সহায়তা নিশ্চিত করা হবে। একই সঙ্গে কৃষি উপকরণ ও উৎপাদনব্যবস্থার উপর পুঁজিবাদী কর নীতি ও কর্পোরেট একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের অবসান ঘটানো হবে।

খিলাফত রাষ্ট্র কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেচ, জ্বালানী, সার, বীজ, কৃষিযন্ত্র এবং খুচরা যন্ত্রাংশের উপর আরোপিত ভ্যাট, শুল্ক ও অন্যান্য পরোক্ষ কর প্রত্যাহার করবে। এর ফলে কৃষকের উৎপাদন ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে, কৃষি হবে অধিক লাভজনক এবং খাদ্যপণ্যের মূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকবে।

ইসলামী ভূমিনীতি অনুযায়ী আবাদযোগ্য কোনো জমি অনাবাদি রাখা নিষেধ। রাষ্ট্র ভূমি পুনর্বণ্টন নীতির মাধ্যমে অনাবাদি জমি, চরাঞ্চল ও অন্যান্য চাষযোগ্য ভূমিকে উৎপাদনের আওতায় আনবে। যদি কোনো ব্যক্তি যথাযথ কারণ ছাড়া দীর্ঘ সময় – সাধারণভাবে তিন বছর – জমি অনাবাদি রাখেন, তবে রাষ্ট্র সেই জমি পুনরুদ্ধার করে এমন ব্যক্তির কাছে হস্তান্তর করবে, যিনি তা আবাদ করবেন। এর ফলে ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হবে এবং কৃষি উৎপাদন ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাবে।

খারাজ ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, রাষ্ট্র ভূমির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে এবং কৃষকদের উৎপাদনে উৎসাহিত করে। এর ফলে কৃষিখাতে একটি গুণগত পরিবর্তন সূচিত হবে; উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, কৃষকের আয় ও জীবনমান উন্নত হবে, খাদ্য নিরাপত্তা সুদৃঢ় হবে এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকবে।

ঐতিহাসিকভাবে দেখা যায়, ইসলামী শাসনামলে খারাজভিত্তিক ভূমিনীতি কৃষি উৎপাদন ও সেচব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এর ফলে বহু অঞ্চল কৃষি উৎপাদনে সমৃদ্ধি অর্জন করে এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা লাভ করে। নাহরাওয়ান খাল ছিল একটি বিশাল সেচ ব্যবস্থার অংশ, যা আব্বাসীয় খিলাফতের অধীনে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছিল। এটি সাম্রাজ্যের শস্যভাণ্ডারে সেচ দিতে এবং বাগদাদে পানি সরবরাহ করার জন্য টাইগ্রিস ও দিয়ালা নদী থেকে পানি প্রবাহিত করত।

ইউফ্রেটিস নদী থেকে শাখা হিসেবে বেরিয়ে আসা ঈসা, সারসার ও মালিক খালের মত গুরুত্বপূর্ণ জলপথগুলো কৃষিজমি ও ফলের বাগানে সেচের জন্য নির্মাণ করা হয়েছিল এবং একই সাথে এগুলো রাজধানীতে পণ্য সরবরাহকারী মালবাহী নৌকা ও মালবাহী জাহাজের পরিবহন পথ হিসেবেও কাজ করত।

৩. রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ভারী শিল্পের মুনাফা থেকে প্রাপ্ত রাজস্বঃ

ভারী শিল্পায়ন হচ্ছে একটি রাষ্ট্রের আত্মনির্ভরতা ও শক্তিশালী সামরিক বাহিনী তৈরির ভিত্তি। রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও কৌশলগত শক্তি গড়ে তুলতে ভারী শিল্প (Heavy Industry) অপরিহার্য। ভারী শিল্প অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিই ত্বরান্বিত করে না, বরং রাষ্ট্রের প্রযুক্তিগত সক্ষমতা, শিল্পভিত্তি এবং জাতীয় নিরাপত্তাকেও সুদৃঢ় করে।

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় যেসব শিল্পে বিপুল মূলধন, উচ্চ প্রযুক্তি এবং দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের প্রয়োজন, সেসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্র সরাসরি বিনিয়োগ ও মালিকানার দায়িত্ব গ্রহণ

করতে পারে। বিশেষ করে এমন শিল্প যা রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা ও জনগণের মৌলিক স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত, যেমন ইস্পাত, যন্ত্রপাতি, প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি, জাহাজ নির্মাণ, মহাকাশ ও বিমান প্রযুক্তি, অটোমেটিভ, টেলিকম স্পেকট্রাম এবং অন্যান্য কৌশলগত শিল্পে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী শিল্পভিত্তি গড়ে তোলা হবে। এসব শিল্প থেকে অর্জিত মুনাফা বাইতুল মালের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজস্ব উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হবে এবং তা পুনরায় শিল্পায়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন, গবেষণা এবং জনকল্যাণে বিনিয়োগ করা হবে।

প্রতিরক্ষা শিল্পের ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কেবল সামরিক শক্তি অর্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং জাতির নিরাপত্তা, স্বাধীনতা এবং প্রতিরোধ ক্ষমতা নিশ্চিত করাও এর উদ্দেশ্য। আল্লাহ্ (ﷻ) বলেন:

«وَاَعِدُّوۡا لَهُمۡ مَّا اسۡتَطَعۡتُمۡ مِّنۡ قُوَّةٍ وَّمِنۡ رِّبَاطِ الۡخَيۡلِ تُرۡهِبُوۡنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ
وَعَدُوَّكُمۡ وَاٰخَرِيۡنَ مِنۡ دُوۡنِهِمۡ ۚ لَا تَعۡلَمُوۡنَهُمۡ ۚ اَللّٰهُ يَعۡلَمُهُمۡ»

“তোমরা তাদের মোকাবিলার জন্য তোমাদের সাধ্যানুযায়ী শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখ, যাতে এর মাধ্যমে তোমরা আল্লাহ্’র শত্রু, তোমাদের শত্রু এবং তাদের বাইরে এমন লোকদের ভীত-সন্ত্রস্ত করতে পার, যাদের তোমরা জান না; আল্লাহ্ তাদের জানেন।” [সূরা আল-আনফাল : ৬০]

এই নির্দেশনার আলোকে খিলাফত রাষ্ট্র আধুনিক প্রতিরক্ষা শিল্প গড়ে তুলবে, যাতে অস্ত্র, সামরিক যান, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং অন্যান্য প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম দেশেই উৎপাদিত হয়। এর ফলে একদিকে জাতীয় নিরাপত্তা সুদৃঢ় হবে, অন্যদিকে প্রতিরক্ষা শিল্পও একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক খাতে পরিণত হবে। অতএব, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ভারী শিল্প কেবল অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যম নয়; বরং এটি জাতীয় নিরাপত্তা, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান এবং স্বনির্ভর অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান ভিত্তি।

উদাহরণস্বরূপ চীনের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ও রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানগুলো (এসওই) (১২.১৮ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার) বার্ষিক রাজস্ব অর্জন করেছে। এমনকি দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর (এসওই) মোট বার্ষিক রাজস্ব প্রায় ৬০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অথচ আমাদের দেশ ব্যাপক আমদানীনির্ভর, পরনির্ভরশীল গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি, FDI, EPZ, ফরেন রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট উপর নির্ভরশীল।

৪. জিযিয়া–অমুসলিম নাগরিকদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার বিনিময়ে রাষ্ট্রের রাজস্ব:

জিযিয়া হলো ইসলামী রাষ্ট্রের একটি স্বীকৃত রাজস্ব উৎস, যা খিলাফত রাষ্ট্রের অধীনে

বসবাসকারী সক্ষম অমুসলিম পুরুষ নাগরিকদের কাছ থেকে আদায় করা হয়, এটি নারী কিংবা শিশুদের জন্য প্রযোজ্য নয়। এর বিনিময়ে রাষ্ট্র তাদের জীবন, সম্পদ, সম্মানের সুরক্ষা নিশ্চিত করে, পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদান করে এবং ন্যায়বিচার ও নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করার দায়িত্ব পালন করে।

কোন দরিদ্র ব্যক্তির উপর জিযিয়া আরোপ করা নিষেধ। অর্থনৈতিক সক্ষমতার ভিত্তিতে বিশেষজ্ঞদের মূল্যায়নের মাধ্যমে নাগরিকদের নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ আয়ের শ্রেণীতে বিভক্ত করা হবে। সেই অনুযায়ী উচ্চ আয়ের ব্যক্তিরা তুলনামূলক বেশী এবং নিম্ন আয়ের ব্যক্তিরা কম জিযিয়া প্রদান করবেন।

জিযিয়া থেকে অর্জিত রাজস্ব কোনো নির্দিষ্ট খাতে সীমাবদ্ধ নয়। রাষ্ট্রের প্রয়োজন, জনস্বার্থ এবং খলিফার ইজতিহাদের ভিত্তিতে এই অর্থ বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক ও প্রশাসনিক কাজে ব্যয় করা হবে।

বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ধারক বাহক আমেরিকা ও ইউরোপের নাগরিকত্ব পাওয়ার আশায় অবস্থানকারী বিভিন্ন দেশ থেকে আগত ব্যক্তিদের সাথে অমানবিক আচরণ করা হয়। তাদেরকে ডিটেনশন সেন্টার রাখা থেকে শুরু করে, হয়রানী করা, বিভিন্ন জুলুম মূলক আইন প্রয়োগ করার পাশাপাশি বিশাল ট্যাক্সের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়। যেমন, সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টে একটি আইন উপস্থাপন করা হয়, যেখানে বলা হয় স্থায়ীভাবে যুক্তরাজ্যে বসবাসের অনুমতি পাওয়ার জন্য আবেদন করতে হলে ১০ হাজার পাউন্ড, যা বাংলাদেশী মুদ্রায় প্রায় ১৬ লাখ ৩০ হাজার টাকা পরিশোধ করতে হবে।

এর বিপরীতে জিজিয়া একটি ইনসাফ ভিত্তিক ব্যবস্থা। যখন মুসলিম বাহিনী ইয়ারমুকের যুদ্ধের আগে জানতে পারে যে, বাইজেন্টাইন-আরব যুদ্ধের কারণে তারা সাময়িকভাবে হোমস্ শহর রক্ষা করতে পারবে না, তখন আবু ওবায়দাহ্ ইবনুল জাররাহ্ (রা.) নির্দেশ দেন যে, শহরের অমুসলিম অধিবাসীদের কাছ থেকে নেয়া জিযিয়া তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হোক। তিনি বলেন: *"আমরা তোমাদের কাছ থেকে জিযিয়া নিয়েছিলাম এই শর্তে যে আমরা তোমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করব। এখন যেহেতু আমরা তা করতে পারছি না, তাই তোমাদের সম্পদ তোমাদের ফিরিয়ে দিচ্ছি।"* এতে শহরের খ্রিস্টান ও অন্যান্য অমুসলিম বাসিন্দারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। ঐতিহাসিক বর্ণনায় এসেছে, তারা মুসলিমদের জন্য দু'আ করে বলেছিল: *"আল্লাহ্ তোমাদের আবার আমাদের কাছে ফিরিয়ে আনুন এবং তোমাদের বিজয় দান করুন। যদি বাইজেন্টাইনরা শাসন করত, তবে তারা কিছুই ফিরিয়ে দিত না; বরং আমাদের যা আছে তাও নিয়ে নিত।"*

৫. যাকাত ফান্ড – সম্পদের পুনর্বণ্টন ও দারিদ্র্য বিমোচনের কার্যকর ব্যবস্থাঃ

যাকাত খিলাফত রাষ্ট্রের স্থায়ী রাজস্ব উৎস। এটি মুসলিমদের নিসাব পরিমাণের অতিরিক্ত সম্পদের উপর আরোপ করা হয়, প্রকৃতপক্ষে যাকাত আদায় করা কোন ব্যক্তি পর্যায়ের বা সামাজিক সংগঠনের কাজ নয়, বরং এটা খিলাফত রাষ্ট্রের দায়িত্ব। রাষ্ট্র ধনী মুসলিমদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করে আল্লাহ্ (ﷻ) নির্ধারিত ৮টি খাতে ব্যয় করবে। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) থেকে শুরু করে খিলাফত বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত প্রায় ১,৪০০ বছর রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায় করা হয়েছে। যাকাত থেকে সংগৃহীত অর্থ রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে আল্লাহ্ (ﷻ) নির্ধারিত আটটি খাতে ব্যয় করা হবে।

বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ট্রিকল ডাউন অর্থনৈতিক মডেলে সম্পদ যেখানে ধনীদের মধ্যে পূঞ্জীভূত থাকে, এর বিপরীতে ইসলামী অর্থনৈতিক মডেলে যাকাত হতে প্রাপ্ত সম্পদের ন্যায্য পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস হয়। এর ফলে সম্পদ কেবল ধনী শ্রেণীর হাতে কেন্দ্রীভূত না থেকে দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল মানুষের কাছেও পৌঁছে যায়।

যাকাতের ব্যায়ের খাত সম্পর্কে আল্লাহ্ (ﷻ) বলেন:

«إِنَّمَا ٱلصَّدَقَـٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱلْعَـٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَـٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ»

“নিশ্চয়ই যাকাত কেবল ফকির, মিসকিন, যাকাত আদায়ে নিয়োজিত কর্মচারী, যাদের অন্তর ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা প্রয়োজন, দাসমুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহ্’র পথে এবং মুসাফিরদের জন্য নির্ধারিত। এটি আল্লাহ্’র পক্ষ থেকে নির্ধারিত বিধান। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়” [সূরা আত-তাওবা : ৬০]। সুতরাং, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রতারণামূলক ওয়েলফেয়ার স্টেটের ধারণার বিপরীতে আল্লাহ্ (ﷻ) নির্ধারিত খাতসমূহের যাকাতের টাকা ব্যয় করার মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব।

যাকাত শুধুমাত্র উদ্বৃত্ত বা নিসাব-পরিমাণ সম্পদের উপর আরোপিত হয়। ফলে এটি মানুষের ন্যূনতম জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় সম্পদের উপর কোনো বোঝা সৃষ্টি করে না এবং সম্পদশালী ব্যক্তির উপরও অন্যায্য আর্থিক চাপ আরোপ করে না। অন্যদিকে, বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় দৈনন্দিন জীবনে ব্যয়কে বিবেচনা না করেই ইনকাম ট্যাক্স, VAT, অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স এর মতো জুলুম চাপিয়ে দেয়া হয়।

ইসলামী বাজেটের এই আয় এবং ব্যয় এর খাতসমূহ কুর'আন-সুন্নাহ্'র ভিত্তিতে হিযবুত তাহ্রীর কর্তৃক প্রণীত খিলাফত রাষ্ট্রের খসড়া সংবিধানের বাজেট সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদসমূহ থেকে নেয়া হয়েছেঃ

অনুচ্ছেদ ১৪৮: রাষ্ট্রের বাজেটের জন্য আহকাম শর'ঈ দ্বারা নির্ধারিত কতগুলো স্থায়ী খাত রয়েছে। বাজেটের (বিভিন্ন খাতের অন্তর্ভুক্ত) বিভাগসমূহের ক্ষেত্রে, তার প্রতিটি বিভাগের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ, এবং প্রত্যেক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ খলিফার মতামত ও ইজতিহাদের উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হবে।

অনুচ্ছেদ ১৪৯: বাইতুল মালের স্থায়ী রাজস্বগুলো হচ্ছে: ফায় (যুদ্ধ লব্ধ মাল), জিযিয়া, খারাজ, রিকাজের (ভূগর্ভস্থ সম্পদ) এক পঞ্চমাংশ এবং যাকাত। প্রয়োজন থাক বা না থাক, এ সকল উৎস থেকে নিয়মিতভাবে অর্থ সংগ্রহ করা হবে।

অনুচ্ছেদ ১৫০: যদি বাইতুল মালের স্থায়ী রাজস্ব রাষ্ট্রের খরচ মিটানোর ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত হয় তবে নিম্নোক্ত প্রেক্ষাপটে মুসলিমদের উপর কর ধার্যের অনুমতি রয়েছে:

১. দরিদ্র, অভাবী, অসহায় পর্যটকের প্রয়োজন মিটাতে এবং জিহাদের বাধ্যবাধকতা পূরণ করতে;

২. পারিতোষিক: যেমন কর্মচারীদের বেতন, শাসকের ভাতা, সৈনিকদের খাদ্য ইত্যাদি;

৩. জনকল্যাণ ও সেবা প্রদানমূলক কাজের জন্য: যেমন রাস্তাঘাট নির্মাণ, পানি আহরণ, মসজিদ, বিদ্যালয় ও হাসপাতাল নির্মাণ ইত্যাদি;

৪. জরুরী অবস্থার প্রয়োজনে, যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ, বন্যা কিংবা ভূমিকম্প ইত্যাদি।

বি.দ্র. এই জাতীয় কর আরোপিত হবে উদ্বৃত্ত সম্পদের উপর, এটা কোনভাবেই মৌলিক আয়ের উপর ধার্য করা যাবে না এবং উপরোক্ত প্রয়োজন মিটানোর পর যে অতিরিক্ত কর অবশিষ্ট থাকবে তা করদাতাদের ফেরত দিতে খলীফা বাধ্য থাকবেন।

অনুচ্ছেদ ১৫১: সীমান্তে আরোপিত শুল্ক রাজস্ব হিসেবে বাইতুল মালে গচ্ছিত হবে। গণ ও রাষ্ট্র মালিকানাধীন সম্পদ থেকে আয়, উত্তরাধিকারীবিহীন সম্পদ, মুরতাদের সম্পত্তি ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের পাশাপাশি এটাও একটি রাজস্ব।

অনুচ্ছেদ ১৫২: বাইতুল মালের খরচ নিম্নোক্ত ছয় প্রকার ব্যক্তির মাঝে বিতরণ হবে:

১. যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত আট প্রকার ব্যক্তি। যদি এ খাত থেকে কোন অর্থ আয় না হয় তবে তাদের কোন অর্থ দেয়া হবে না।

২. যদি যাকাতের অর্থ অপর্যাপ্ত হয় তবে দরিদ্র, অভাবী, অসহায় পর্যটক, ঋণগ্রস্থ এবং জিহাদের অর্থ স্থায়ী রাজস্বের উৎস থেকে প্রদান করা হবে। যদি স্থায়ী রাজস্ব উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থ অপর্যাপ্ত হয়, তবে ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি কোন সাহায্য পাবে না। দরিদ্র, অভাবী, অসহায় পর্যটক এবং জিহাদের অর্থ উক্ত খাতে আরোপিত বিশেষ কর থেকে সংগৃহীত হবে। যদি প্রয়োজন হয়, এবং বিশৃঙ্খলা এড়াতে রাষ্ট্র এ খাতে ঋণ (সুদমুক্ত ও শারী'আহ্ অনুমোদিত) নিয়ে প্রয়োজন মিটাতে পারে।

৩. রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনরত ব্যক্তিবর্গের প্রয়োজন মিটাতে বাইতুল মাল অর্থের যোগান দেয়। যেমন কর্মচারী, শাসকবৃন্দ এবং সৈনিক। যদি এ সংক্রান্ত অর্থ বরাদ্দ অপর্যাপ্ত হয়, তবে রাষ্ট্র বিশেষ কর আরোপ করে উক্ত অর্থ সংগ্রহ করতে পারে, এবং বিশৃঙ্খলা এড়াতে এ খাতে ঋণ (সুদমুক্ত ও শারী'আহ্ অনুমোদিত) গ্রহণ করা যেতে পারে।

৪. বাইতুল মাল জরুরী সেবা ও প্রয়োজনের জন্য অর্থ যোগান দেয়, যথা: রাস্তাঘাট, মসজিদ, হাসপাতাল এবং বিদ্যালয়। যদি এ সংক্রান্ত অর্থ বরাদ্ধ অপ্রতুল হয়, তবে রাষ্ট্র বিশেষ কর আরোপ করে এ খরচের অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে।

৫. অন্যান্য অতিরিক্ত সেবার ক্ষেত্রেও বাইতুল মাল অর্থ যোগান দেয়। যদি অর্থ বরাদ্দ অপ্রতুল হয় তবে ততক্ষণাৎ এ বিষয়ে কোন খরচ করা হবে না এবং এ সংক্রান্ত অর্থ সংস্থান বিলম্বিত হবে।

৬. দুর্যোগ যেমন ভূমিকম্প এবং বন্যার ক্ষেত্রে বাইতুল মাল থেকে অর্থ বরাদ্দ করা হবে। যদি অর্থ বরাদ্দ অপ্রতুল হয় তবে ঋণগ্রহণ (সুদমুক্ত ও শারী'আহ্ অনুমোদিত) করা হবে এবং পরবর্তীতে কর থেকে তা পরিশোধ করা হবে।

আল্লাহ্ (ﷻ) বলেন,

«وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰٓ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوْا۟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَـٰتٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَـٰكِن كَذَّبُوا۟ فَأَخَذْنَـٰهُم بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ»

"আর যদি সেসব জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে অবশ্যই আমি তাদের জন্য আসমান ও যমীনের বরকতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম..." [সূরা আল-আ'রাফ : ৯৬]।

উপসংহারঃ

সম্মেলনের বক্তব্যগুলো থেকে এটা পরিস্কার যে, শুধুমাত্র সৎলোকের শাসন আর দুর্নীতিমুক্ত আমলাতন্ত্রের অনুপস্থিতির কারণেই অর্থনীতির এই ভঙ্গুর অবস্থা নয়, বরং এর মুল কারণ পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোর অনুসরণ। তাই, জনকল্যাণমুখী বাজেট প্রণয়নের জন্য একটি বিকল্প অর্থনৈতিক কাঠামোর দরকার। ইসলামী অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিত্তিতে প্রণীত বাজেটই একমাত্র বিকল্প বাজেট – যা ভঙ্গুর অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণ, কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ এবং সর্বোপরি জনকল্যাণ নিশ্চিত করবে।

হে মুসলিমগণ,

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর নিষ্ঠাবান নেতৃত্ব আপনাদেরকে শুধুমাত্র একটি বিকল্প বাজেটের দিকে নয়, বরং বিকল্প অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দিকে, সর্বোপরি বিকল্প বিশ্ব ব্যবস্থার দিকে আহ্বান করছে – যা নবুয়তের আদলে খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হবে।

আসন্ন খিলাফত রাষ্ট্র শুধু মুসলিমদেরই নয়, বরং সমগ্র মানবজাতিকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার জুলুম থেকে মুক্ত করবে। এবং বিশ্বব্যাপী উপনিবেশবাদীদের কর্তৃক চলমান সামরিক, রাজনৈতিক ও সংস্কৃতি আগ্রাসন থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করবে।

হিযবুত তাহ্‌রীর, ১৯৫৩ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজ পর্যন্ত নিরলসভাবে মুসলিম উম্মাহ্‌কে মানবজাতির চূড়ান্ত কল্যাণ তথা নবুয়তের আদলে খিলাফত প্রতিষ্ঠার দিকে আহ্বান করে আসছে। পুঁজিবাদের জুলুমের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে ইসলামের অর্থনীতির ছায়াতলে বসবাসের জন্য দেশের জনগণ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

হে মুসলিমগণ,

এগিয়ে আসুন, **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর সাথে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করুন। বাস্তবায়ন করুন সেই খিলাফতের শাসন, যা জমিনের বুকে ন্যায়বিচার ফিরিয়ে আনবে, সেই শাসন যার ওয়াদা স্বয়ং আল্লাহ্ (ﷻ) এবং তাঁর রাসূল (ﷺ) আমাদেরকে দিয়েছেন।

«وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مِنۡكُمۡ وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسۡتَخۡلِفَنَّهُمۡ فِى الۡاَرۡضِ كَمَا اسۡتَخۡلَفَ الَّذِيۡنَ مِنۡ قَبۡلِهِمۡ»

“তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে আর সৎকাজ করে আল্লাহ্ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে তিনি তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে খিলাফত (শাসনকর্তৃত্ব) দান করবেন যেমন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে তিনি খিলাফত দান করেছিলেন...” [সূরা আন-নূর : ৫৫]

«...ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ...»

“...তারপর আল্লাহ্ যখন তা উঠিয়ে নেওয়ার ইচ্ছা করবেন তখন উঠিয়ে নেবেন (যুলুমের শাসনের অবসান ঘটাবেন)। অতঃপর আবারো ফিরে আসবে খিলাফত, নবুয়তের আদলে...” (হাদিস : মুসনাদে আহমদ)

যোগাযোগঃ

হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

www.ht-bangladesh.info

contact.hizb.tahrir.bd@gmail.com

WhatsApp: +880 1323 842 703

মূল্য : ২০ টাকা মাত্র